সোমনাথ হোর

চিত্ত প্রসাদ

চিত্ত প্রসাদ অতি সুপুরুষ ছিলেন। দীর্ঘদেহী বৃষস্কন্ধ উন্নত নাসা এবং পদ্মপলাশলোচন। এগুলি দৃশ্য ছিল; যা দেখতে পেতাম না কিন্তু অনুভব করতাম— সেটা তাঁর মহান হৃদয়। তাঁর ক্রোধ ছিল, অসহিষ্ণুতা ছিল; কিন্তু পাত্রভেদে ভালবাসা যেন উপচে পড়ত। আমি তাঁর কাছ থেকে শুধু ভালবাসাই পেয়েছি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের খুব বেশি কিছু জানতাম না। শুনেছিলাম— মেদিনীপুর জেলায় তাঁর জন্ম। চট্টগ্রামে কবে কেন এলেন, জানা নেই। কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার আগে তিনি নাকি কিছুটা বাউণ্ডুলে ছিলেন। আঁকা এবং গানবাজনা নিয়ে থাকতেন। চট্টগ্রামের প্রখ্যাত এবং প্রয়াত কম্যুনিস্ট নেতা পূর্ণেন্দু দস্তিদার তাঁর সন্ধান পান এবং তাঁকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে তৎকালীন সাম্যবাদী আন্দোলনে সামিল করেন। কিছুদিনের মধ্যেই পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশি তাঁর অঙ্কন পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বম্বেতে পার্টির সদর দফতরে নিয়ে যান।

আমার সঙ্গে যখন পরিচয় হয়, তখন তিনি পঞ্চাশের মন্বন্তরের অসহায় শিকার অজস্র নরনারীর ছবি এঁকে চলেছেন এবং সেগুলি সাম্যবাদী মুখপাত্র Peoples War এবং জনযুদ্ধে অনবরত ছাপা হচ্ছে। সুনীল জানার আলোকচিত্র এবং চিত্ত প্রসাদের রেখাংকন ভারতের বুদ্ধিজীবী মহলকে তখন সচকিত করে তুলেছিল। এমন মর্মস্পর্শী রেখাচিত্র পেশাদার শিল্পীদেরও বিচলিত করেছিল। আমরা জয়নুল আবেদীনের অবিস্মরণীয় চিত্রগুলির কথা জানি। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা যেমন অতুল বসু, গোবর্ধন আশ, সুধীর খাস্তগীর এবং আরও অনেকে মন্বন্তরের উপরে ছবি করেছেন। চিত্ত প্রসাদের কাজ তাঁদের হয়ত সরাসরি প্রভাবান্বিত করেনি, কিন্তু তাঁর ছবিগুলি শিল্পী-দের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে যেন সতর্কবাণী হিসাবে কাজ করেছিল।

তিনি আমার প্রথম দীক্ষাগুরু। প্রায় হাতে ধরে ক্ষুধিত পীড়িত মুমূর্ষুদের অবয়ব আঁকায় উৎসাহ জুগিয়েছেন। যখনই চট্টগ্রামে যেতেন, আমি তাঁর অবিরাম সঙ্গ পেতাম। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ওঁর সঙ্গে ঘোরাঘুরি

করতাম। রাত্রে লণ্ঠনের আলোয় বসে দেখতাম সারাদিনে করা পেন্সিলে আঁকা স্কেচগুলিকে অবলীলায় চাইনীজ ইংকের কালি তুলি দিয়ে ভরাট করে তুলেছেন। মনে পড়ে, তিনি বলছেন— "সোমনাথ, এই যে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি, কী বড় বড় চোখ, কত চুল, কত দিন খেতে পায়নি, চোখগুলি কী রকম জ্বলজ্বল করছিল, ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, কণ্ঠা বুকের পাঁজরা, আহা-রে, বেরিয়ে আসতে চাইছে…" আমি শুনে যেতাম, হুঁ-হাঁ করতাম; বুঝতে পারতাম উনি নিজের সঙ্গে কথা বলছেন, সমগ্র দৃশ্য মনের চোখে দেখছেন এবং ছবিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছেন। একবার ভরা বর্ষায় কুতুবদিয়া কক্সবাজার চলে গেলেন দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের ছবি এঁকে আনতে। চট্টগ্রামের বর্ষা শুরু হয় ত, শেষ হয় না। প্রায় মাস খানেক বাদে ফিরলেন — অনেক ছবি এঁকে। কমিউনে বসে সেগুলি দেখিয়ে প্রত্যেকটির বর্ণনা দেন। সেই বর্ণনা শুনে এবং ছবি দেখে আমি বিহ্বল হয়ে যেতাম। এই একমাস ধরে খাওয়া-দাওয়ার অনিয়মের দরুন শরীর বেশ খারাপ হয়েছিল; উনি সে সব গ্রাহ্যই করতেন না।

চিত্ত প্রসাদের ভুখা বাংলার ছবিগুলি বিশিষ্টতার দাবি রাখে। সুনীল জানার ফটোগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল— চারপাশে কি নির্মম ঘটনা ঘটছে; এবং ঘটনাগুলি সত্য, প্রত্যক্ষ। চিত্ত প্রসাদের ছবিগুলি সেই সত্যে আরেক মাত্রা যোগ করে মানুষের হৃদয়কে তাদের অস্তিত্বকে মথিত করছিল। দুর্ভিক্ষপীড়িতের এমন জোরালো এবং ধারালো রূপণ আমরা কমই দেখেছি।

এ সময়ে চট্টগ্রামী ভাষায়— তিনি বেশ কিছু গান রচনা করেন— যা খোদ চাঁটগেঁয়েরাও অত জোরালোভাবে লিখতে পারেননি। শহরে গ্রামে বিভিন্ন জনসভায় পার্টি কর্মীরা সে সব গান যখন করতেন — শ্রোতারা কখনও চোখের জলে ভাসতেন, কখনও সুরে সুর মিলিয়ে সংগ্রামের আওয়াজ তুলতেন, আবার কখনও কালোবাজারী সমাজবিরোধীদের উদ্দেশ্যে ধিক্কার জানাতেন,

'শুনরে ওগো দেশবাসী, শুন যত নারী
বহু দুঃখের শেষে আজুয়া জীবন যার গৈ ছাড়ি…'

'চাটিগাঁইয়া হাজার হাজার আঁরা হিঁদু মোছলমান
ঢেউয়র মাথাং সাম্পান চালাই, সিনা দি ঠেকাই ঝড়তুফান…'

'পেট মোটা সব ইঁদুর হিয়াল গাতখুনে ডাকে,
কঅজর বোঁদা লারের তারা, গরম দাম-অ হাঁকে…' ইত্যাদি।

১৯৪৮-৪৯ সালে পার্টির সংকীর্ণতাবাদী নীতি গ্রহণের সময় পি সি যোশি সম্পাদক পদ থেকে অপসারিত হন। এতে চিত্ত প্রসাদ অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ক্রমশঃ সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসতে থাকেন। সংস্কৃতিক্ষেত্রে যাঁরা যোশির ব্যক্তিগত উদ্যোগে পার্টিতে এসেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই পরবর্তীকালে অল্পবিস্তর ক্ষোভ এবং অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়েছেন কিন্তু সাম্যবাদের প্রতি অবিচল বিশ্বস্ততার কারণে পার্টি সংগঠনের বিরুদ্ধতা করতে পারেননি। চিত্ত প্রসাদ এই পরিস্থিতিকে মেনে নিতে পারেননি। পরে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের হস্তক্ষেপের ফলে পার্টির অভ্যন্তরে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। চিত্ত প্রসাদ এই সময়ে আরও দৃঢ়ভাবে যোশির রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর জোরালো সমর্থক হয়ে ওঠেন। কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ায় এবং রাজনীতির জটিল উপসর্গগুলি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল না-থাকার ফলে ধীরে ধীরে রাজনীতি থেকে সরে আসেন।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে মাঝে মাঝে কলকাতায় ওঁর সঙ্গে দেখা হত। খালেদ চৌধুরী এবং প্রভাস সেনের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে উঠতেন, রেবা এবং আমি কলকাতায় এসেছেন জানতে পেলেই ওঁর সঙ্গে দেখা করতাম। একদিন দেখি নিউ মার্কেট থেকে একটি মস্ত বড় গ্লাডিয়োলি ফুলের তোড়া নিয়ে ঢুকে বললেন— "ছবি আঁকব; আজ ৩০৲ টাকায় একটি ছবি বিক্রি হয়েছে। সবটা দিয়ে এই তোড়া এবং তেল রঙ, তুলি কিনে নিয়ে এলাম।" সব টাকা পেয়েই ওরকম হাতেনাতে খরচ করা আমরা ভাবতেই পারতাম না। ঐ সময়ে ঐ বাড়িতে বেশ কিছু তেলরঙে কাজ করছিলেন। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ এসব থেকে সরে এসে কিছু ঐতিহাসিক, কিছু লোকায়ত জীবনের ছবি করেছিলেন মনে পড়ে। যখনই নূতন কিছু করতেন, বম্বে থেকে চিঠি লিখে জানাতেন। মাঝে মাঝে লিনোকাট ছেপেও পাঠাতেন; Tissue paper-এ ছাপা হত বলে— এগুলি সময়ের ব্যবধানে নষ্ট হয়ে যেত। বম্বের নীচুতলার বাসিন্দাদের যেমন, মৎস্যজীবী, সব্জিওয়ালা, কিশোর-কিশোরী, মজুর মজুরানী— এদের নিয়ে অনেক ছবি করেছেন। একবার ওঁর নির্দেশে এ রকম এক সেট ছবি নিয়ে শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসু মশায়কে দেখিয়েছিলাম। উনি ছবি দেখে খুশি হয়ে চিত্ত প্রসাদকে নিজে লিখে জানান। তাতে চিত্তদা উচ্ছ্বসিত আবেগে আমাকে একখানি চিঠি লেখেন, যা সৌভাগ্যক্রমে এখনও প্রায় অক্ষত আছে*। এসময়ে আরও অনেক অনেক ছবি করেন— যা দেশে বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী শান্তি আন্দোলনের উপরও অনেক ছবি করেছেন। ১৯৬০ সালের গোড়া

* পরিশিষ্ট অংশে চিঠিটি ছাপা হয়েছে।

থেকে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে। সম্ভবত এ সময়ে চিত্ত প্রসাদ পুতুল নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। শুনেছি এগুলি অসাধারণ সৃষ্টি। নিজের সন্তানের মতো এগুলি লালন করতেন। এ সময়ে তাঁর খুব অনটন। তথাপি কেউ যদি ভালবেসেও সাহায্যের হাত বাড়াতেন, করুণা ভেবে তাঁদের হাঁকিয়ে দিয়ে বন্ধু বিচ্ছেদের পথ নিতেন। আবার এও সত্যি, কেউ কেউ তাঁর দুঃসময়ের সুযোগ নিয়ে তাঁকে নানাভাবে প্রবঞ্চনা করেছেন।

আন্ধেরীর (বম্বে) এক জনবহুল শ্রমিক এলাকায় একটি ঘর নিয়ে থাকতেন শুনেছি। এ সময়ে সুরা তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়। আমি তাঁকে কখনও সুরাপান করতে দেখিনি। কোনো নারী যদি তাঁকে ভালবেসে থাকেন, আমি বলব তিনি উপযুক্ত কাজই করেছেন। অত বিশাল হৃদয় সুন্দর লোকটিকে ভাল না বেসে পারা যায় না। কিন্তু তার জ্বালাও ত কম নয়। মৃত্যু অবধি একটি দীর্ঘ সময় এই যন্ত্রণা তাঁকে দিল যত, নিলও তত। মহৎ শিল্পীর জীবনে দেয়া নেয়ার এই টানা পোড়েন অনিন্দনীয়।

শান্তিনিকেতন
২০. ৮. ১৯৯১